ISSN:3139-1192(Online)

# SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

December 2024
Volume- 2

Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya, Ashoknagar, North 24 Parganas, West Bengal- 743223

Contents lists available at https://scintia.in/

SCINTIA

Online Peer-reviewed Multidisciplinary Journal

ISSN: 3139-1192 (Online)

[Published by Netaji Satabarshiki Mahavidyalaya]

# গ্রন্থ আলোচনাঃ সৌম্য ভট্টাচার্য, "সোনালি সকাল"। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২।

পৃথা কুণ্ডু

*সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা- ৩৫*

*Correspondent author E-mail address*: pritha_kundu2@rediffmail.com.

পুস্তক আলোচনার ক্ষেত্রে "মলাট সমালোচনা" কথাটি প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, আর "মহাজনের পন্থানুসরণপূর্বক" ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বিমল মিত্রের "সাহেব বিবি গোলাম" উপন্যাসটির সমালোচনা শুরু করেছিলেন "মলাট সমালোচনা" দিয়েই। মলাট বা প্রচ্ছদ থেকে একটি বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করে ফেলা হয়ত নিতান্ত সহজ নয়, তবু সৌম্য ভট্টাচার্যের 'সোনালি সকাল' উপন্যাসের সূর্য-চিহ্নিত মলাট গোড়া থেকেই আগ্রহ জাগায় ব্লার্বে-উল্লিখিত বঙ্গীয় নবজাগরণের পটভূমি-আশ্রিত বিশ শতকের প্রথম পর্যায়টির প্রতি।

'নতুন আলো'র পরবর্তী পর্ব 'সোনালি সকাল' প্রেক্ষাপট ও ভাবনার নিরিখে ঐতিহাসিক উপন্যাস তো অবশ্যই, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও নানা ধাঁচ— 'রোমান্স' থেকে শুরু করে

**To cite this article**: Kundu, P. (2024). গ্রন্থ আলোচনাঃ সৌম্য ভট্টাচার্য, "সোনালি সকাল"। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২. *Scintia*, 2, 96–102.

আঞ্চলিকতা, গণচেতনা-- সবই তার মধ্যে পড়ে। তার মধ্যে এটি কোন্ জাতীয়, সে নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। আঙ্গিকের দিক থেকে এ উপন্যাস অনেকটাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রথম আলো’র কাছাকাছি, কিন্তু সেখানে ইতিহাসের বৃহৎ পটভূমি ধরা দিয়েছিল সাধারণ, কাল্পনিক কয়েকটি চরিত্রের চোখ দিয়ে। বর্তমান যুগের পাঠকের সঙ্গে ঐতিহাসিক, বিখ্যাত চরিত্রগুলির যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেছিল তারা। ‘সোনালি সকাল’-এ সে ধরনের ‘সাধারণ’ চরিত্র প্রায় নেই বললেই চলে—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইতিহাসের পটপরিবর্তন ধরা দিয়েছে যার চোখে, সেই কিশোরও ভবিষ্যতের এক খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব—প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। এই চরিত্রটির সঙ্গে পাঠকের আত্মীয়তা গড়ে উঠতে গিয়েও ওঠে না, তার বাল্যস্মৃতি, নদীপথে বেড়াতে যাওয়া, লতার সঙ্গে প্রণয়-সঞ্চারের কয়েকটি মুহূর্ত স্নিগ্ধ-মধুর ভালোলাগার আবেশ তৈরি করলেও সে আবেশ দানা বাঁধার অবকাশ পায় না, তার পর-পরই এসে পড়ে গুরুতর, অন্যতর দিকে আলোকপাতের দায়বদ্ধতা।

উপন্যাসে লেখক ধরতে চেয়েছেন বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার সময় থেকে প্রায় এক দশকের ঘটনাপ্রবাহ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াণে তার সমাপ্তি। ঘটনাস্রোতের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকা বাস্তব চরিত্রগুলির মানসিক সংঘাত মাঝে মধ্যে ধরা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার থেকেও বেশি করে সামনে এসেছে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁদের ভাবনাচিন্তার বিনিময়, কখনও তাতে পারস্পরিক সহমর্মিতার বার্তা, কখনও বা বিতর্কের পথে বিরোধিতার উত্তেজনা। এতে ব্যক্তিমানুষদের ছাপিয়ে তাঁদের মতাদর্শই বড় হয়ে উঠেছে। একদিকে বঙ্গবিভাগের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কার্জন-রিজলি-কিচেনার, অন্যদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিন্ন ভিন্ন পন্থার খোঁজে ভগিনী নিবেদিতা-সরলা দেবী-অরবিন্দ ঘোষ আর দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত গান্ধীজি, আর এক দিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি-দর্শন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে নতুন আলোর দিশা দেখানোর স্বপ্নসন্ধানী

রবীন্দ্রনাথ-ব্রহ্মবান্ধব-জগদীশচন্দ্রের মত মনীষা। উপন্যাসে এত বার দেখা গেছে এক জন মহাব্যক্তিত্বের সঙ্গে আর এক জনের সংলাপ-দৃশ্য, যা এক-এক সময় ক্লান্তিকর মনে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের "কালী দ্য মাদার" কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করছেন নিবেদিতা আর অরবিন্দ। বিপ্লবের পথ, গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে কথা চলছে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু আর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে ভারতীয় দর্শন আর আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বাদানুবাদ হচ্ছে অক্সফোর্ড-এর পণ্ডিত-অধ্যাপক ডঃ স্টাউটের। ভারতীয় রসায়নের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে পুরো একটি অধ্যায় জুড়ে বক্তৃতার ধাঁচে বলে চলেছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মাঝে মাঝে মন্তব্যসহ তা শুনছেন রাজশেখর বসু। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ নিয়ে কথোপকথন চলছে উপেন্দ্রকিশোর, মহেশচন্দ্র আতর্থী আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। 'পাগলা সন্ন্যাসী' রামকুমার বিদ্যারত্নের সঙ্গে দীর্ঘ কাব্য-আলোচনা চলছে প্রভাত আর প্রেমাঙ্কুর-এর। মাঝে মাঝেই কবিতা বা চিঠিপত্র থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি। একই কথার পুনরাবৃত্তি। এক জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দ ওকাকুরা-প্রসঙ্গে নিবেদিতাকে সাবধান করে দিচ্ছেন কঠিন ভাষায়, আবার কয়েক পাতা পরেই সেই বাক্যগুলি আবার ফিরে আসে—নিবেদিতার মনে পড়ছে সেই সব কথা। 'মনে পড়া' বোঝানোর জন্য এতখানি পুনরাবৃত্তি কি অপরিহার্য? এ রকম ঘটেছে আরও কয়েকবার। জগদীশচন্দ্র আপন মনে যা ভাবছেন, সেই কথাগুলিই আবার বলছেন রবীন্দ্রনাথের সামনে। এত কথা আর আলোচনার বাহুল্যে উপন্যাসটির গঠন হয়ে উঠেছে অনেকটাই "ডিসকারসিভ", পেছনে চলে গেছে তার "ন্যারেটিভ" সত্তা।

বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারা নতুন নয়, বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের যুগ থেকে শুরু করে অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই ধারায় এসেছে নানা পরিবর্তন। প্রাচীন বা মধ্যযুগের পটভূমিতে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাথমিক ভিত্তি হতে পারে লোকগাথা, চারণগীতি,

পাঁচালি, কড়চা, পুঁথি, সেকালের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরের কিছু উল্লেখ আর তার সঙ্গে মেশে অনেকখানি কল্পনা। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী যে ঐতিহাসিক কালপর্ব, তাকে লেখকের মনের মত করে গড়ে নেওয়া সহজ নয়। তথ্যনিষ্ঠতার দায় সেখানে অনেক সময়ই ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করতে চায়। আর সেই অনতিদূর-ইতিহাসের যে সব বাস্তব, যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে উঠেছে কাহিনি, তাঁদের জীবন ও কর্ম যদি হয় নিজেদের লেখনীতে, বা অতি-ঘনিষ্ঠজনের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মৃতিচারণায় তথ্যবদ্ধ, তাহলে সেই আবরণ ভেদ করে তাঁদের অন্তরলোকে প্রবেশ করা, তাঁদের 'চরিত্র' হিসেবে তুলে ধরার কাজটি আরও কঠিন। রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ-নিবেদিতা-- এঁদের 'চরিত্র' হিসেবে ব্যবহার করে 'সোনালি সকাল'-এর মত একখানি বৃহৎ আয়তনের উপন্যাস দাঁড় করাতে গিয়ে লেখককে বার বার এই বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বোঝাই যায়।

সমগ্র উপন্যাসে এ-হেন বাধা অতিক্রমের সুযোগ যে একেবারেই আসে নি, তা নয়। "মহামানব" বা "মহীয়সী" পরিচয়ের আড়ালে এই সব স্বনামধন্য চরিত্র যে আসলে রক্তমাংসের মানুষ, তা বুঝিয়ে দেওয়ার মত বেশ কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে লেখকের কলমে। তবু সামগ্রিক ভাবে ঐতিহাসিকতার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার তাগিদ যেন বড় হয়ে উঠেছে ব্যক্তি-অনুভবের চেয়ে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, রুশ-জাপান যুদ্ধ সংক্রান্ত কয়েকটি অংশ তো একেবারেই প্রতিবেদনধর্মী। তারই মধ্যে মনে দাগ কেটে যায় সেই মুহূর্তটি, যেখানে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর শোকার্ত রবীন্দ্রনাথ আহত, বিস্মিত হন একতলার বৈঠকখানা থেকে ভেসে আসা তাঁরই একান্ত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর শুনে— "রবিকা এটা কী যে করল!... খুড়ির শেষ সময়ে একটা হাতুড়ে হোমিয়োপ্যাথকে ধরে রইল, বড় কোন ডাক্তারকে দেখাল না!" কবির মধ্যমা কন্যা রেণুকার দুঃখবিড়ম্বিত জীবন ও শেষ পরিণতির বিবরণও মর্মস্পর্শী। তবে বাবার সামনেই রেণুকা

তাঁর অপদার্থ স্বামীকে "ঢ্যাঁড়শ" বলে উল্লেখ করছেন—সেকালের রুচিশীল ব্রাহ্ম পরিবারে, বিশেষ করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে কি এই ধরনের ভাষা ব্যবহার প্রকাশ্যে ঘটত? আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োগ সেকালের সঙ্গে মানানসই মনে হয় নি। অনুশীলন সমিতির বা যুগান্তর দল গড়ে ওঠার পর্বে, বিপ্লববাদীদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ, অহংবোধের যে লড়াই দেখানো হয়েছে, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু একে অপরকে আক্রমণ করতে গিয়ে যে ধরনের শব্দ তাঁদের মুখে বসানো হয়েছে, তা এই প্রজন্মের মুখে শোনা যায়; বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় তা চলত না।

উপন্যাসের বেশ খানিক অংশ জুড়ে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকালে গান্ধী-কস্তুরবার পারিবারিক জীবনের কথা। গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্টই জানিয়েছেন, স্বামী হিসেবে প্রথম জীবনে তিনি মোটেই উদার বা সহনশীল ছিলেন না। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর চরম সাংসারিক অশান্তি সত্ত্বেও এক ধরনের মানিয়ে-নেওয়া দাম্পত্যের চিত্রটি উল্লেখের দাবি রাখে। লর্ড কার্জনের কঠিন, সাম্রাজ্যবাদী শাসক-রূপের পাশাপাশি ফুটে উঠেছে স্বামী হিসেবে তাঁর কোমল দিকটি, ধরা দিয়েছে তাঁর শিল্পরসিক সত্তাও— যার আলোয় তিনি দিল্লির দরবারে শিল্প প্রদর্শনীতে গিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা "শাহজাহানের স্বপ্ন" ছবিটির মর্মার্থ। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দুই জাপানি চিত্রকরের শৈল্পিক আদানপ্রদান উঠে এসেছে লেখকের ভাবনায়। তবে নিবিষ্ট পাঠকের চোখে ধরা পড়বে, টাইক্কান যেখানে রাসলীলার ছবি আঁকছেন, সেই অংশটির বর্ণনা সরাসরি অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা "জোড়াসাঁকোর ধারে" থেকে নেওয়া। সবচেয়ে বেশি করে দাগ কেটে যায় উপন্যাসের শেষদিকে, শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে থাকাকালীন ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়-মথিত করা "ব্যক্তিগত" প্রশ্নটি— জন্মসূত্রে ভারতীয় বা "হিন্দু" না হলে কি সত্যি এই দেশ বা জাতিকে আপন করে নেওয়া যায় না? রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাসের

“প্লট” শুনতে গিয়ে, নায়কের আত্মপরিচয়ের সংকটের আলোয় যেন নিজেকেই খুঁজে পান নিবেদিতা, তাঁর মনে হয়—নিজের সর্বস্ব দিয়ে ভারতবর্ষকে আপন করতে চেয়েও কি তিনি “বিদেশিনী”ই রয়ে গেছেন? দরজা বন্ধ করে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির সামনে কেঁদে ওঠেন—“টেল মি, কিং, অ্যাম আই নট আ হিন্দু?

“রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত” এই উপন্যাসে প্রত্যাশিত ভাবেই ধরা দিয়েছে কবির নানা সত্তা। তারই মধ্যে বিশেষ করে সাধুবাদ প্রাপ্য লেখকের, গীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য। পূজা পর্যায়ের গান রচনায় ফাঁকবিহীন তাল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার পর্বটি উঠে এসেছে সুচারু বর্ণনায়। “দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া” গানটির স্বরলিপি করার সময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতকার কাঙালিচরণ সেন কবিকে ধরিয়ে দেন, গানটিকে প্রচলিত বারো মাত্রায় ফেলা যাচ্ছে না। ন’মাত্রায় ফাঁক হলে তবেই তা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ একটু ভেবে নিয়ে বলেন, এগারো মাত্রাই থাক। ফাঁক না হয় না-ই রইল। এমনিতেই তাঁর জীবনে অনেক ফাঁক, তাই নিজের সৃষ্টিতে অন্তত ফাঁক রাখতে তিনি চান না। এভাবেই তৈরি হল রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল “একাদশী”। সৃষ্টির নেপথ্যকাহিনির এই কল্পনাটুকু পাঠকের মন ছুঁয়ে যাওয়ার মত। অথচ, স্বদেশি যুগের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের গান রচনায় যে এক নতুন দিক খুলে গিয়েছিল— মার্গসঙ্গীত-অনুপ্রাণিত ধ্রুপদ, খেয়াল অঙ্গের ভাঙা গান, পারিবারিক ধর্মীয় কর্তব্যের তাগিদে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা থেকে তাঁর সৃজনী সত্তার অভিমুখ পরিবর্তিত হয়ে বাংলার বাউল, সারি ইত্যাদি দেশি সুরের মাদকতায় স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনায় যে জোয়ার এনেছিল, সে বিষয়ে উপন্যাসটি নীরব। এদিকে উপন্যাসের কালপর্বে ওই সময়টিই প্রাধান্য পেয়েছে, তাই এই অভাববোধ পাঠককে কিছুটা হতাশ করে। শেষ অধ্যায়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রয়াণের অভিঘাতও যেন একটি যুগের অবসান-অনুভূতি পুরোপুরি ব্যক্ত করতে পারল না। বাংলার “নবজাগরণ”-পর্বের নানা দিক, বহু ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন

সূত্রের সমন্বয়সাধনের প্রয়াসে লেখকের পরিশ্রম আর আন্তরিকতা স্পষ্ট, কিন্তু ঐতিহাসিকতা থেকে মহাকাব্যিকতায় উত্তরণের যাত্রা রয়ে যায় অসম্পূর্ণ। ক্রমপরিবর্তনশীল "কাল" যে উপন্যাসের নেপথ্যনায়ক, সেখানে এই অসমাপ্তির বোধ হয়ত স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়াই শ্রেয়।